শ্যামলী

শ্যামলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া শ্রীমতী রাণী মহলানবীশ —

ইঁটকাঠে গড়া নীরস খাঁচার থেকে
আকাশবিলাসী চিত্তেরে মোর এনেছিলে তুমি ডেকে
শ্যামল শুশ্রূষায়,
নারিকেলবন-পবন-বীজিত নিকুঞ্জ আঙিনায়।
শরৎ-লক্ষ্মী কনকমাল্যে জড়ায় মেঘের বেণী,
নীলাম্বরের পটে আঁকে ছবি সুপারিগাছের শ্রেণী।
দক্ষিণধারে পুকুরের ঘাট বাঁকা সে কোমর-ভাঙা,
লিলি গাছ দিয়ে ঢাকা তা'র ঢালু ডাঙা।
জামরুল গাছে ধরে অজস্র ফুল,
হরণ করেছে সুরবালিকার হাজার কানের দুল।
লতানে যূথীর বিতানে মৌমাছিরা
করিতেছে ঘোরা-ফিরা।
পুকুরের তটে তটে
মধুচ্ছন্দা রজনীগন্ধা, সুগন্ধ তার বটে।
ম্যাগনোলিয়ার শিথিল পাপড়ি খ'সে খ'সে পড়ে ঘাসে,
ঘরের পিছন হ'তে বাতাবির ফুলের খবর আসে।
এক-সার মোটা পায়া-ভারি "পাম" উদ্ধত মাথা-তোলা,
রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছে, যেন বিলিতি পাহারা-ওলা।

বসি যবে বাতায়নে
কল্‌মি শাকের পাড় দেখা যায় পুকুরের এক কোণে।

বিকেল বেলার আলো
জলে রেখা কাটে সবুজ সোনালি কালো।
ঝিলিমিলি করে আলোছায়া চুপে চুপে
চল্‌তি হাওয়ার পায়ের চিহ্নরূপে।
জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে
আমের শাখায় আঁখি ধেয়ে যায় সোনার রসের আশে।
লিচু ভরে যায় ফলে
বাদুড়ের সাথে দিনে আর রাতে অতিথির ভাগ চলে।
বেড়ার ওপারে মৈসুমি ফুলে রঙের স্বপ্ন বোনা,
চেয়ে দেখে দেখে জানালার নাম রেখেছি—"নেত্রকোণা"।
ওরাওঁ জাতের মালি ও মালিনী ভোর হতে লেগে আছে
মাটি খোঁড়াখুঁড়ি, জল ঢালাঢালি গাছে।
মাটি-গড়া যেন নিটোল অঙ্গ, মাটির নাড়ির টানে
গাছপালাদের স্বজাত ব'লেই জানে।
রাত পোহালেই পাড়ার গোয়ালা গাভী দুটি নিয়ে আসে,
অধীর বাছুর ছুটোছুটি করে পাশে।
সাড়ে ছ'টা বাজে, সোজা হয়ে রোদ চলে আসে মোর ঘরে,
পথে দেখা দেয় খবরওয়ালা বাইক'রথের 'পরে।
পাঁচিল পেরিয়ে পুরোনো দোতলা বাড়ি
আল্‌সের ধারে এলোকেশিনীরা ঝোলায় সিক্ত সাড়ি।
পাড়ার মেয়েরা জল নিতে আসে ঘাটে,
সবুজ গহনে দু চোখ ডুবিয়ে সোনার সকাল কাটে।

বাংলাদেশের বনপ্রকৃতির মন
সহর এড়িয়ে রচিল এখানে ছায়া দিয়ে ঘেরা কোণ।
বাংলাদেশের গৃহিনী তাহার সাথে
আপন স্নিগ্ধ হাতে
সেবার অর্ঘ্য করেছে রচনা নীরব প্রণতি ভরা,
তারি আনন্দ কবিতায় দিল ধরা।

শুনেছি এবার হেথায় তোমার ক'দিনের ঘরবাড়ি
চলে যাবে তুমি ছাড়ি'।
মেঘরৌদ্রের খেলার সৃষ্টি ঐ পুকুরের ধারে
লজ্জিত হবে অকবি ধনীর দৃষ্টির অধিকারে।
কালের লীলায় দিয়ে যাব সায়, খেদ রাখিব না চিতে,
এ ছবিখানি তো মন হতে ধনী পারিবে না কেড়ে নিতে।
তোমার বাগানে দেখেছি তোমারে কাননলক্ষ্মীসম,
তাহারি স্মরণ মম,
শীতের রৌদ্রে মুখর বর্ষারাতে
কুলায়বিহীন পাখীর মতন
মিলিবে মেঘের সাথে ॥

১ ভাদ্র, ১৩৪৩
শান্তিনিকেতন

সূচী

শ্যামলী

দ্বৈত

সেদিন ছিলে তুমি আলো আঁধারের মাঝখানটিতে,
বিধাতার মানসলোকের
মর্ত্ত্য সীমায় পা বাড়িয়ে
বিশ্বের রূপ-আঙিনার নাছ্-দুয়ারে।
যেমন ভোরবেলাকার একটুখানি ইসারা,
শালবনের পাতার মধ্যে উসুখুসু,
শেষরাত্রের গায়ে-কাঁটা-দেওয়া
আলোর আড়-চাহনি ;
উষা যখন আপ্‌না-ভোলা
যখন সে পায়নি আপন ডাক-নামটি পাখীর ডাকে.
পাহাড়ের চূড়ায় মেঘের লিখনপত্রে।
তারপরে সে নেমে আসে ধরাতলে,
তার মুখের উপর থেকে
অসীমের ছায়া-ঘোমটা খ'সে পড়ে
উদয়-সাগরের অরুণরাঙা কিনারায়।
পৃথিবী তাকে সাজিয়ে তোলে
আপন সবুজ সোনার কাঁচলি দিয়ে ;
পরায় তাকে আপন হাওয়ার চুনরী।

তেমনি তুমি এনেছিলে তোমার ছবির তনুরেখাটুকু
আমার হৃদয়ের দিক্‌প্রান্তপটে।

আমি তোমার কারিগরের দোসর,
কথা ছিল তোমার রূপের 'পরে মনের তুলি
আমিও দেব বুলিয়ে,
পূরিয়ে তুলব তোমার গড়নটিকে।
দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে।
আমাব প্রাণের হাওয়া
বইয়ে দিয়েছি তোমার চারিদিকে
কখনো ঝড়ের বেগে
কখনো মৃদুমৃদু দোলনে।
একদিন আপন সহজ নিবালায় ছিলে তুমি অধরা,
ছিলে তুমি একলা বিধাতার ;
একের মধ্যে একঘ'রে।
আমি বেঁধেছি তোমাকে দুইয়ের গ্রন্থিতে,
তোমার সৃষ্টি আজ তোমাতে আর আমাতে,
তোমার বেদনায় আর আমার বেদনায়।
আজ তুমি আপনাকে চিনেছ
আমার চেনা দিয়ে।
আমার অবাক চোখ লাগিয়েছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া,
জাগিয়েছে আনন্দরূপ
তোমার আপন চৈতন্যে।

২৩ মে, ১৯৩৬

শেষ পহরে

ভালোবাসার বদলে দয়া
যৎসামান্য সেই দান,
সেটা হেলাফেলারই স্বাদ-ভোলানো।
পথের পথিকও পারে তা বিলিয়ে দিতে
পথের ভিখারীকে,
শেষে ভুলে যায় বাঁক পেরতেই।
তার বেশি আশা করিনি সেদিন।

চলে গেলে তুমি রাতের শেষ প্রহরে।
মনে ছিল বিদায় নিয়ে যাবে
শুধু ব'লে যাবে—"তবে আসি।"
যে কথা আর-একদিন বলেছিলে,
যা আর কোনোদিন শুনব না,
তার জায়গায় ঐ দুটি কথা,
ঐটুকু দরদের সরু বুননিতে যেটুকু বাঁধন পড়ে
তাও কি সইত না তোমার ?

প্রথম ঘুম যেমনি ভেঙেছে
বুক উঠেছে কেঁপে,
ভয় হয়েছে সময় বুঝি গেল পেরিয়ে।
ছুটে এলেম বিছানা ছেড়ে।
দূরে গির্জ্জের ঘড়িতে বাজল সাড়ে বারোটা।

রৈলেম বসে আমার ঘরের চৌকাঠে
দরজায় মাথা রেখে,—
তোমার বেরিয়ে যাবার বারান্দার সামনে।
অতি সামান্য একটুখানি সুযোগ
অভাগীর ভাগ্য তাও নিল ছিনিয়ে,
পড়লেম ঘুমে ঢ'লে,
তুমি যাবাব কিছু আগেই।
আড়চোখে বুঝি দেখলে চেয়ে
এলিয়ে-পড়া দেহটা;
ডাঙায়-তোলা ভাঙা নৌকোটা যেন।
বুঝি সাবধানেই গেছ চলে,
ঘুম ভাঙে পাছে।
চম্‌কে জেগে উঠেই বুঝেছি
মিছে হয়েছে জাগা।
বুঝেছি, যা যাবার তা গেছে এক নিমেষেই,
যা পড়ে থাকবার তাই রইল প'ড়ে
যুগযুগান্তর।

চুপচাপ চারিদিক
যেমন চুপচাপ পাখীহারা পাখীর বাসা
গানহারা গাছের ডালে।
কৃষ্ণসপ্তমীর মিইয়ে-পড়া জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশেছে
ভোরবেলাকার ফ্যাকাসে আলো,
ছড়িয়ে পড়েছে আমার পাঙাশ-বরণ শূন্য জীবনে।
গেলেম তোমাব শোবার ঘরের দিকে
বিনা কারণে।

দরজার বাইরে জ্বলছে
ধোঁওয়ায় কালী-পড়া হারিকেন লণ্ঠন,
বারান্দায় নিবো-নিবো শিখার গন্ধ।
ছেড়ে-আসা বিছানায় খোলা মশারি
একটু একটু কাঁপছে বাতাসে।
জানলার বাইরের আকাশে
দেখা যায় শুকতারা,
আশা-বিদায়-করা
যত ঘুমহারাদের সাক্ষী।
হঠাৎ দেখি ফেলে গেছ ভুলে
সোনাবাঁধানো হাতির দাঁতের লাঠিগাছটা।
মনে হোলো, যদি সময় থাকে,
তবে হয়তো ষ্টেশন থেকে ফিরে আসবে খোঁজ করতে;
কিন্তু ফিরবে না
আমার সঙ্গে দেখা হয়নি ব'লে।

২৩ মে, ১৯৩৬

আমি

আমারি চেতনার রঙে পান্না হোলো সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্ব'লে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর,
সুন্দর হোলো সে।
তুমি বলবে এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়,—
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহঙ্কার,
অহঙ্কার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহঙ্কার-পটেই
বিশ্বকর্ম্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
না, না, না,
না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ,
না-আমি, না-তুমি।
ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে, "আমি"।

সেই আমির গহনে আলো আঁধারের ঘটল সঙ্গম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।
না কখন ফুটে উঠে হোলো হাঁ, মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

এ'কে বোলো না তত্ত্ব ;
আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব-আমিব রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ।

পণ্ডিত বলছেন—
বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।
একদিন দেবে চরম টান তার সাগরে পর্ব্বতে ;
মর্ত্ত্যলোকে মহাকালের নূতন খাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,
গিলে ফেলবে দিনরাতের জমাখরচ ;
মানুষের কীর্ত্তি হারাবে অমরতার ভান,
তার ইতিহাসে লেপে দেবে
অনন্ত রাত্রির কালি।
মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।

শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,
জ্বলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে,
বাজবে না সুর।
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—
"তুমি সুন্দর,"
"আমি ভালোবাসি"।
বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগযুগান্তর ধ'রে ;
প্রলয়-সন্ধ্যায় জপ করবেন,—
"কথা কও কথা কও",
বলবেন, "বলো, তুমি সুন্দর,"
বলবেন, "বলো, আমি ভালোবাসি ?"

২৯ মে, ১৯৩৬

সম্ভাষণ

রোজই ডাকি তোমার নাম ধ'রে,
বলি, চারু।
হঠাৎ ইচ্ছা হোলো আর কিছু বলি,
যাকে বলে সম্ভাষণ,
যেমন বল্‌ত সত্যযুগের ভালোবাসায়।
সব চেয়ে সহজ ডাক—প্রিয়তমে।
সেটা আবৃত্তি করেছি মনে-মনে,
তার উত্তরে মনে-মনেই শুনেছি তোমার উচ্চহাসি।
বুঝেছি, মন্দমধুর হাসি এ যুগের নয়;
এ যে নয় অবন্তী, নয় উজ্জয়িনী।

আটপহুরে নামটাতে দোষ কী হোলো
এই তোমার প্রশ্ন।
বলি তবে।
কাজ ছিল না বেশি,
সকাল সকাল ফিরেছি বাসায়।
হাতে বিকেলের খবরের কাগজ,
বসেছি বারান্দায়, রেলিঙে পা দুটো তোলা।
হঠাৎ চোখে পড়্‌ল পাশের ঘরে
তোমার বৈকালিকী সাজের ধারা।
বাঁধছিলে চুল আয়নার সামনে
বেণী পাকিয়ে পাকিয়ে, কাঁটা বিঁধে বিঁধে।
এমন মন দিয়ে দেখিনি তোমাকে অনেকদিন;
দেখিনি এমন বাঁকা ক'রে মাথা-হেলানো
চুল-বাঁধার কারিগরিতে,

এমন দুই হাতের মিতালি
চুড়িবালার ঠুনঠুনির তালে।
শেষে ঐ ধানীরঙের আঁচলখানিতে
কোথাও কিছু ঢিল দিলে,
আঁট করলে কোথাও বা,
কোথাও একটু টেনে দিলে নিচের দিকে,
কবিরা যেমন ছন্দ বদল করে
একটু-আধটু বাঁকিয়ে চুরিয়ে।

আজ প্রথম আমার মনে হোলো
অল্প মজুরির দিন-চালানো
একটা মানুষের জন্যে
নিজেকে তো সাজিয়ে তুলছে
আমাদের ঘরের পুরোনো বউ
দিনে দিনে নতুন-দাম-দেওয়া রূপে।
এ তো নয় আমার আটপহুরে চারু।
ঠিক এমনি ক'রেই দেখা দিত অন্যযুগের অবন্তিকা
ভালোলাগার অপরূপবেশে
ভালোবাসার চকিত চোখে।
অমরুশতকের চৌপদীতে
—শিখরিণীতে হোক্ স্রগ্ধরায় হোক্—
ওকে তো ঠিক মানাত।
সাজের ঘর থেকে বসবার ঘরে
ঐ যে আসছে অভিসারিকা
ও যেন কাছের কালে আসছে
দূরের কালের বাণী।

বাগানে গেলেম নেমে।
ঠিক করেছি আমিও আমার সোহাগকে দেব মর্য্যাদা
শিল্পে-সাজিয়ে-তোলা মানপত্রে।
যখন ডাকব তোমাকে ঘরে
সে হবে যেন আবাহনী।
সামনেই লতা ভরেছে সাদা ফুলে,—
—বিলিতি নাম, মনে থাকে না,—
নাম দিয়েছি তারাঝরা ;
রাতের বেলায় গন্ধ তার
ফুলবাগানের প্রলাপের মতো।
এবার সে ফুটেছে অকালে
সবুর সয়নি শীত ফুরোবার।
এনেছি তার একটি গুচ্ছ,
তারো একটি সই থাকবে আমার নিবেদনে।

আজ গোধূলি লগ্নে তুমি ক্লাসিকযুগের চারুপ্রভা,
আমি ক্লাসিকযুগের অজিতকুমার।
তুটি কথা আজ বলব আমি,
সাজানো কথা—
হাসতে হয় হেসো।
সে কথা মনে-মনে গড়ে তুলেছি
যেমন ক'রে তুমি জড়িয়ে তুলেছ তোমার খোঁপা।
বলব, "প্রিয়ে, এই পরদেশী ফুলের মঞ্জরী
আকাশে চেয়ে খুঁজছিল বসন্তের রাত্রি,
এনেছি আমি তাকে দয়া ক'রে
তোমার ঐ কালো চুলে॥"

৩০ মে, ১৯৩৬

স্বপ্ন

ঘন অন্ধকার রাত,
বাদলের হাওয়া
এলোমেলো ঝাপট দিচ্ছে চারদিকে।
মেঘ ডাকছে গুরুগুরু,
থর্‌থর্‌ করছে দরজা,
খড়্‌খড়্‌ ক'রে উঠছে জানলাগুলো।
বাইরে চেয়ে দেখি
সার-বাঁধা সুপুরি নারকেলের গাছ
অস্থির হয়ে দিচ্ছে মাথা-ঝাঁকানি।
দুলে' উঠছে কাঁঠাল গাছের ঘন ডালে
অন্ধকারের পিণ্ডগুলো
দল-পাকানো প্রেতের মতো।
রাস্তার থেকে পড়েছে আলোর রেখা
পুকুরের কোণে
সাপ-খেলানো আঁকাবাঁকা।
মনে পড়ছে ঐ পদটা—
"রজনী সাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
......স্বপন দেখিনু হেনকালে।"
সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবিব চোখের কাছে
কোন্‌ একটি মেয়ে ছিল,
ভালোবাসার কুঁড়ি-ধরা তার মন,
মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে কাজল-পরা,
ঘাটের থেকে নীলসাড়ি
"নিঙাড়ি নিঙাড়ি"-চলা।

আজ এই ঝোড়ো রাতে
তাকে মনে আনতে চাই
তার সকালে তার সাঁঝে,
তার ভাষায়, তার ভাবনায়
তার চোখের চাহনিতে,
তিন-শো বছর আগেকার
কবির জানা সেই বাঙালির মেয়েকে।
দেখতে পাইনে স্পষ্ট ক'রে।
আজ পড়েছে যাদের পিছনের ছায়ায়
তারা সাড়ির আঁচল যেমন ক'রে বাঁধে
কাঁধের 'পরে,
খোঁপা যেমন ক'রে ঘুরিয়ে পাকায়
পিছনে নেমে-পড়া,
মুখের দিকে যেমন ক'রে চায় স্পষ্টচোখে
তেমন ছবিটি ছিল না
সেই তিন-শো বছর আগেকার কবির সামনে।
তবু—"রজনী সাঙন ঘন
......স্বপন দেখিনু হেনকালে। —"
শ্রাবণের রাত্রে এমনি ক'রেই রয়েছে সেদিন
বাদলের হাওয়া,
মিল রয়ে গেছে
সেকালের স্বপ্নে আর একালের স্বপ্নে।

৩০ মে, ১৯৩৬

প্রাণের রস

আমাকে শুনতে দাও
আমি কান পেতে আছি।
পড়ে আসছে বেলা ;
পাখীরা গেয়ে নিচ্চে দিনের শেষে
কণ্ঠের সঞ্চয় উজাড়-ক'রে-দেবার গান।
ওরা আমার দেহ-মনকে নিল টেনে
নানা সুরের নানা রঙের
নানা খেলার
প্রাণের মহলে।
ওদের ইতিহাসের আর কোনো সাড়া নেই
কেবল এইটুকু কথা,—
আছি, আমরা আছি, বেঁচে আছি,
বেঁচে আছি এই আশ্চর্য্য মুহূর্ত্তে।
—এই কথাটুকু পৌঁছল আমার মর্ম্মে।
বিকেলবেলায় মেয়েরা জল ভ'রে নিয়ে যায় ঘটে,
তেমনি ক'রে ভরে নিচ্চি প্রাণের এই কাকলী
আকাশ থেকে
মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে।
আমাকে একটু সময় দাও।
আমি মন পেতে আছি।
ভাঁটা-পড়া বেলায়,
ঘাসের উপরে ছড়িয়ে-পড়া বিকেলের আলোতে
গাছেদের নিস্তব্ধ খুসি,
মজ্জার মধ্যে লুকোনো খুসি,
পাতায় পাতায় ছড়ানো খুসি।

আমার প্রাণ নিজেকে বাতাসে মেলে দিয়ে
নিচ্চে বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস
চেতনার মধ্যে দিয়ে ছেঁকে।
এখন আমাকে বসে থাকতে দাও
আমি চোখ মেলে থাকি।

তোমরা এসেছ তর্ক নিয়ে।
আজ দিনান্তের এই পড়ন্ত রোদ্দুরে
সময় পেয়েছি একটুখানি ;
এব মধ্যে ভালো নেই মন্দ নেই,
নিন্দা নেই, খ্যাতি নেই।
দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই,
আছে বনের সবুজ,
জলের ঝিকিমিকি,—
জীবনস্রোতেব উপর তলে
অল্প একটু কাঁপন, একটু কল্লোল,
একটু ঢেউ।
আমার এই একটুখানি অবসর
উড়ে চলেছে
ক্ষণজীবী পতঙ্গের মতো
সূর্য্যাস্তবেলার আকাশে
রঙীন ডানার খেলা শেষ করতে
বৃথা প্রশ্ন কোরো না।
বৃথা এনেছ তোমাদের যত দাবী।
আমি বসে আছি বর্ত্তমানের পিছন মুখে
অতীতের দিকে গড়িয়ে-পড়া ঢালুতটে।

নানান বেদনায় খেয়ে-বেড়ানো প্রাণ
একদিন ক'রে গেছে লীলা
ঐ বনবীথির ডাল দিয়ে বিনুনি-করা
আলোছায়ায়।
আশ্বিনে দুপুর বেলা
এই কাঁপনলাগা ঘাসের উপর
মাঠের পারে কাশের বনে
হাওয়ায় হাওয়ায় স্বগত উক্তি
মিলেছে আমার জীবনবীণার ফাঁকে ফাঁকে।

যে সমস্যাজাল
সংসারের চারিদিকে পাকে-পাকে জড়ানো
তার সব গিঁঠ গেছে ঘুচে।
যাবার পথের যাত্রী পিছনে যায়নি ফেলে
কোনো উদ্যোগ, কোনো উদ্বেগ, কোনো আকাঙ্ক্ষা;
কেবল গাছের পাতার কাঁপনে
এই বাণীটি রয়ে গেছে—
তারাও ছিল বেঁচে,
তারা যে নেই, তার চেয়ে সত্য ঐ কথাটি।
শুধু আজ অনুভবে লাগে
তাদের কাপড়ের রঙের আভাস,
পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার হাওয়া,
চেয়ে দেখার বাণী,
ভালোবাসার ছন্দ,
প্রাণগঙ্গার পূর্ব্বমুখী ধারায়
পশ্চিম প্রাণের যমুনার স্রোত॥

১ জুন, ১৯৩৬

হারানো মন

দাঁড়িয়ে আছ আড়ালে,
ঘরে আসবে কিনা ভাবছ সেই কথা।
একবার একটু শুনেছি চুড়ির শব্দ।
তোমার ফিকে পাটকিলে রঙের আঁচলের একটুখানি
দেখা যায় উড়ছে বাতাসে
দরজার বাইরে।
তোমাকে দেখতে পাচ্চিনে,
দেখছি পশ্চিম আকাশের রোদ্দুর
চুরি করেছে তোমার ছায়া,
ফেলে রেখেছে আমার ঘরের মেঝের 'পরে।

দেখছি সাড়ির কালো পাড়ের নিচে থেকে
তোমার কনক গৌরবর্ণ পায়ের দ্বিধা
ঘরের চৌকাঠের উপর।
আজ ডাকব না তোমাকে।
আজ ছড়িয়ে পড়েছে আমার হাল্‌কা চেতনা
যেন কৃষ্ণপক্ষের গভীর আকাশে নীহারিকা,
যেন বর্ষণশেষে মিলিয়ে-আসা সাদা মেঘ
শরতের নীলিমায়।

আমার ভালোবাসা
যেন সেই আল-ভেঙে-যাওয়া ক্ষেতের মতো
অনেকদিন হোলো চাষী যাকে
ফেলে দিয়ে গেছে চলে ;
আন্‌মনা আদিপ্রকৃতি
তার উপরে বিছিয়েছে আপন স্বত্ব
নিজের অজানিতে।
তাকে ছেয়ে উঠেছে ঘাস,
উঠেছে অনামা গাছের চারা,
সে মিলে গেছে চারদিকের বনের সঙ্গে।
সে যেন শেষরাত্রির শুকতারা,
প্রভাত আলোয় ডুবে গেল
তার আপন আলোর ঘটখানি।

আজ কোনো সীমানা দেওয়া নয় আমার মন,
হয়তো তাই ভুল বুঝ্‌বে আমাকে।
আগেকার চিহ্নগুলো সব গেছে মুছে,
আমাকে এক ক'রে নিতে পারবে না কোনোখানে,
কোনো বাঁধনে বেঁধে॥

১ জুন, ১৯৩৬

চিরযাত্রী

অস্পষ্ট অতীত থেকে বেরিয়ে পড়েছে ওরা দলে দলে,
ওরা সন্ধানী, ওরা সাধক,
বেরিয়েছে পুরাপৌরাণিক কালের
সিংহদ্বার দিয়ে।
তার তোরণের রেখা
আঁচড় কেটেছে অজানা আখরে,
ভেঙে-পড়া ভাষায়।

যাত্রী ওরা, রণযাত্রী,
ওদের চিরযাত্রা অনাগতকালের দিকে।
যুদ্ধ হয়নি শেষ
বাজছে নিত্যকালের দুন্দুভি।
বহুশত যুগের পদপতন শব্দে
থর্‌থর্‌ করে ধরিত্রী,
অর্দ্ধেক রাত্রে দুরুদুরু করে বক্ষ,
চিত্ত হয় উদাস,
তুচ্ছ হয় ধনমান,
মৃত্যু হয় প্রিয়।
তেজ ছিল যাদের মজ্জায়,
যারা চলতে বেরিয়েছিল পথে
মৃত্যু পেরিয়ে আজো তারাই চলেছে ;

যারা বাস্তু ছিল আঁক্‌ড়িয়ে
তারা জীয়ন-মরা, তাদের নিঝুম বস্‌তি
বোবা সমুদ্রের বালুর ডাঙায়।
তাদের জগৎজোড়া প্রেতস্থানে,
অশুচি হাওয়ায়
কে তুলবে ঘর,
কে রইবে চোখ উল্‌টিয়ে কপালে,
কে জমাবে জঞ্জাল!

কোন্ আদিকালে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে
বিশ্বপথের চৌমাথায়।
পাথেয় ছিল রক্তে, পাথেয় ছিল স্বপ্নে,
পাথেয় ছিল পথেই।
যেই এঁকেছে নক্‌সা,
ঘর বেঁধেছে পাকা গাঁথুনির
ছাদ তুলেছে মেঘ ঘেঁষে,
পরের দিন থেকে মাটির তলায়
ভিৎ হয়েছে ঝাঁঝ্‌রা,
সে বাঁধ বেঁধেছে পাথরে পাথরে,
তলিয়ে গেছে বন্যার ধাক্কায়।
সারারাত হিসেব করেছে স্থাবর সম্পদের,
রাতের শেষে হিসেবে বেরলো সর্ব্বনাশ।
সে জমা করেছে ভোগের ধন সাতহাট থেকে,
ভোগে লেগেছে আগুন,
আপন তাপে গুম্‌রে গুম্‌রে
গেছে ভোগের জোগান্ আঙার হয়ে।

তার রীতি, তার নীতি তার শিকল তার খাঁচা
চাপা পড়েছে মাটির নিচে
পরযুগের কবরস্থানে।

কখনো বা ঘুমিয়েছে সে
ঝিমিয়ে-পড়া নেশার আসরে বাতি-নেবা দালানে,
আরামের গদি পেতে।
অন্ধকারে ঝোপের থেকে
ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্কন্ধকাটা দুঃস্বপ্ন,
পাগ্‌লা জন্তুর মতো
গোঁ গোঁঃ শব্দে, ধরেছে তার টুঁটি চেপে,
বুকের পাজরগুলোয় ঠক্‌ ঠক্‌ দিয়েছে নাড়া,
গুঙ্‌রে উঠে জেগেছে সে মৃত্যুযন্ত্রণায়।
ক্ষোভের মাতুনিতে ভেঙে ফেলেছে মদের পাত্র,
ছিঁড়ে ফেলেছে ফুলের মালা।
বারে বারে রক্তে পিছল দুর্গমে
ছুটে এসেছে শতচ্ছিদ্র শতাব্দীর বাইরে
পথ-না-চেনা দিক্‌সীমানার অলক্ষ্যে।
তার হৃৎপিণ্ডের রক্তের ধাক্কায় ধাক্কায়
ডমরুতে বেজেছে গুরু গুরু,—
"পেরিয়ে চলো, পেরিয়ে চলো।"

ওরে চিরপথিক,
করিস নে নামের মায়া,
রাখিস্‌নে ফলের আশা,
ওরে ঘরছাড়া মানুষের সন্তান।

কালের রথচলা রাস্তায়
বারেবারে কা'রা তুলেছিল জয়ের নিশানা,
বারেবারে পড়েছে চুরমার হয়ে
মানুষের কীর্ত্তিনাশা সংসারে।
লড়াইয়ে-জয়করা রাজত্বের প্রাচীর
সে পাকা করতে গেছে ভুল সীমানায়।
সীমানাভাঙার দল ছুটে আসছে
বহু যুগ থেকে
বেড়া ডিঙিয়ে পাথর গুঁড়িয়ে
পার হয়ে পর্ব্বত ;
আকাশে বেজে উঠছে নিত্যকালের দুন্দুভি,
—"পেরিয়ে চলো,
পেরিয়ে চলো।"

৪ জুন, ১৯৩৬

বিদায়-বরণ

চার প্রহর রাতের বৃষ্টি-ভেজা ভারি হাওয়ায়
থম্‌কে আছে সকাল বেলাটা,
রাত-জাগার ভারে যেন মুদে এসেছে
মলিন আকাশের চোখের পাতা।
বাদ্‌লার পিছল পথে পা টিপে চলেছে প্রহরগুলো।
যত সব ভাবনার আবছায়া
উড়ছে ঝাঁক বেঁধে মনের চারদিকে
হাল্‌কা বেদনার রং মেলে দিয়ে।
তাদের ধরি-ধরি করে মনটা,
ভাবি, বেঁধে রাখি লেখায় ;
পাশ কাটিয়ে চলে যায় কথাগুলো।
এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত কিছু ঝাপ্‌সা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ,
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া,
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি
যেন ঘোমটাপরা অভিমানিনী।

মন বলছে, ডাকো ডাকো,
ঐ ভেসে-যাওয়া পারের খেয়ার আরোহিণী
ওকে একবার ডাকো ফিরে,

দিনান্তের সন্ধ্যাদীপটি তুলে ধরো
ওর মুখের দিকে ;
করো ওকে বিদায়-বরণ ।
বলো তুমি সত্য, তুমি মধুর,
তোমারই বেদনা আজ লুকিয়ে বেড়ায়
বসন্তের ফুলফোটা আর ফুলঝরার ফাঁকে ।
তোমার ছবি-আঁকা অক্ষরের লিপিখানি
সবখানেই,
নীলে সবুজে সোনায়
রক্তের রাঙা রঙে ।
তাই আমার আজ মন ভেসেছে
পলাশ বনের চিকন ঢেউয়ে,
ফাটা মেঘের কিনার দিয়ে উপ্‌চে-পড়া
আচম্‌কা রোদ্দুরের ছটায় ।

৩ জুন, ১৯৩৬

তেঁতুলের ফুল

জীবনে অনেক ধন পাইনি,
নাগালের বাইরে তা'রা,
হারিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি,
হাত পাতিনি ব'লেই।
সেই চেনা সংসারে
অসংস্কৃত পল্লীরূপসীর মতো
ছিল এই ফুল মুখঢাকা,
অকাতরে উপেক্ষা করেছে উপেক্ষাকে,
এই তেঁতুলের ফুল।

বেঁটে গাছ পাঁচিলের ধারে,
বাড়তে পারে নি কৃপণ মাটিতে :
উঠেছে ঝাঁকড়া ডাল মাটির কাছ ঘেঁষে।
ওর বয়স হয়েছে যায় নি বোঝা।

অদূরে ফুটেছে নেবু ফুল,
গাছ ভরেছে গোলকচাঁপায়,
কোণের গাছে ধরেছে কাঞ্চন,
কুড়্চি-শাখা ফুলের তপস্যায় মহাশ্বেতা।
স্পষ্ট ওদের ভাষা,
ওরা আমাকে ডাক দিয়ে করেছে আলাপ।

আজ যেন হঠাৎ এল কানে
কোন্ ঘোমটার নিচে থেকে চুপিচুপি কথা।
দেখি পথের ধারে তেঁতুলশাখার কোণে
লাজুক একটি মঞ্জরী,
মৃদু বসন্তী রং,
মৃদু একটি গন্ধ,
চিকন লিখন তা'র পাপড়ির গায়ে।

সহরের বাড়িতে আছে
শিশুকাল থেকে চেনাশোনা অনেক কালেব তেঁতুল গাছ,
দিকপালের মতো দাঁড়িয়ে
উত্তরপশ্চিমকোণে,
পরিবারের যেন পুরোনো কালের সেবক,
প্রপিতামহের বয়সী।
এই বাড়ির অনেক জন্মমৃত্যুব পর্ব্বের পর পর্ব্বে,
সে দাঁড়িয়ে আছে চুপ ক'রে,
যেন বোবা ইতিহাসের সভাপণ্ডিত।
ঐ গাছে ছিল যাদের নিশ্চিত দখল কালে কালে,
তাদের কত লোকের নাম
আজ ওর ঝরা পাতার চেয়েও ঝরা,
তাদের কত লোকের স্মৃতি
ওর ছায়ার চেয়েও ছায়া।

একদিন ঘোড়ার আস্তাবল ছিল ওর তলায়,
খুরের খট্‌খটানিতে অস্থির;
খোলার-চালা-দেওয়া ঘরে।

কবে চলে গেছে সহিসের হাঁক-ডাকা
সেই ঘোড়া-বাহনের যুগ
ইতিবৃত্তের ওপারে।
আজ চুপ হয়েছে হ্রেষাধ্বনি,
রং বদল করেছে কালের ছবি।
সর্দ্দার কোচ্‌ম্যানের সযত্নসজ্জিত দাড়ি,
চাবুকহাতে তার সগর্ব্ব উদ্ধত পদক্ষেপ,
সেদিনকার সৌখীন সমারোহের সঙ্গে
গেছে সাজ-পরিবর্ত্তনের মহানেপথ্যে।
দশটা বেলার প্রভাত রৌদ্রে
ঐ তেঁতুলতলা থেকে এসেছে দিনের পর দিন
অবিচলিত নিয়মে ইস্কুলে-যাবার গাড়ি।
বালকের নিরুপায় অনিচ্ছার বোঝাটা
টেনে নিয়ে গেছে রাস্তার ভিড়ের মাঝখান দিয়ে।

আজ আর চেনা যাবে না সেই ছেলেকে,
না দেহে, না মনে, না অবস্থায়।
কিন্তু চিরদিন দাঁড়িয়ে আছে
সেই আত্মসমাহিত তেঁতুল গাছ
মানবভাগ্যের ওঠা-নামার প্রতি
ভ্রূক্ষেপ না ক'রে।

মনে আছে একদিনের কথা।
রাত্রি থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি ;
ভোরের বেলায় আকাশের রঙ
যেন পাগলের চোখের তারা।

দিক্‌হারানো ঝড় বইছে এলোমেলো,
বিশ্বজোড়া অদৃশ্য খাঁচায় মহাকায় পাখী
চারদিকে ঝাপট মারছে পাখা।
রাস্তায় দাঁড়াল জল,
আঙিনা গেছে ভেসে।
বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি
ক্রুদ্ধ মুনির মতো ঐ গাছ মাথা তুলেছে আকাশে,
তার শাখায় শাখায় ভর্ৎসনা।
গলির দুইধারে কোঠাবাড়িগুলো হতবুদ্ধির মতো,
আকাশের অত্যাচারে
প্রতিবাদ করবার ভাষা নেই তাদের।
একমাত্র ঐ গাছটার পত্রপুঞ্জের আন্দোলনে
আছে বিদ্রোহের বাণী,
আছে স্পর্দ্ধিত অভিসম্পাৎ।
অন্তহীন ইটকাঠের মূকজড়তার মধ্যে
ঐ ছিল একা মহারণ্যের প্রতিনিধি ;
সেদিন দেখেছি তার বিক্ষুব্ধ মহিমা বৃষ্টিপাণ্ডুর দিগন্তে।

কিন্তু যখন বসন্তের পর বসন্ত এসেছে,
অশোক বকুল পেয়েছে সম্মান,
ওকে জেনেছি যেন ঋতুরাজের বাহির-দেউড়ির দ্বারী ;
উদাসীন উদ্ধত।
সেদিন কে জেনেছিল—
ঐ রূঢ় বৃহতের অন্তরে সুন্দরের নম্রতা,
কে জেনেছিল, বসন্তের সভায় ওর কৌলিন্য।

ফুলের পরিচয়ে আজ ওকে দেখছি
যেন গন্ধর্ব্ব চিত্ররথ,
যে ছিল অর্জ্জুনবিজয়ী মহারথী,
গানের সাধন কর্‌ছে সে আপন মনে একা
নন্দনবনের ছায়ার আড়ালে গুন্‌গুন্‌ সুরে।
সেদিনকার কিশোর কবির চোখে
ঐ প্রৌঢ় গাছের গোপন যৌবন মদিরতা
যদি ধরা পড়ত উপযুক্ত লগ্নে,
মনে আসছে, তবে
মৌমাছির পাখা-উতল-করা
কোন্‌ এক পরম দিনের তরুণ প্রভাতে
একটি ফুলের গুচ্ছ করতেম চুরি,
পরিয়ে দিতেম কেঁপে-ওঠা আঙুল দিয়ে
কোন্‌ একজনের আনন্দে-রাঙা কর্ণমূলে।
যদি সে সুধাত, কী নাম,
হয়তো বলতেম,—
ঐ যে রৌদ্রের একটুক্‌রো পড়েছে তোমার চিবুকে
ওর যদি কোনো নাম তোমার মুখে আসে
এ'কেও দেব সেই নামটি॥

৭ জুন, ১৯৩৬

অকাল ঘুম

এসেছি অনাহূত।
কিছু কৌতুক করব ছিল মনে,
আচম্‌কা বাধা দেব অসময়ে
কোমরে-আঁচলজড়ানো গৃহিণীপনায়।
দুয়ারে পা বাড়াতেই চোখে পড়ল,—
মেঝের 'পরে এলিয়ে-পড়া
ওর অকাল ঘুমের রূপখানি।

দূর পাড়ায় বিয়ে-বাড়িতে বাজছে সানাই সারঙ্‌ সুরে।
প্রথম প্রহর পেরিয়ে গেছে
জ্যৈষ্ঠরৌদ্রে ঝাম্‌রে-পড়া সকাল বেলায়।
স্তরে স্তরে দুখানি হাত গালের নিচে,
ঘুমিয়েছে শিথিল দেহে
উৎসবরাতের অবসাদে
অসমাপ্ত ঘরকন্নার একধারে।
কর্ম্মস্রোত নিস্তরঙ্গ ওর অঙ্গে অঙ্গে,
অনাবৃষ্টিতে অজয় নদের
প্রান্তশায়ী শ্রান্ত জলশেষের মতো।

ঈষৎ খোলা ঠোঁটদুটিতে মিলিয়ে আছে
মুদে-আসা-ফুলের মধুর উদাসীনতা।
দুটি ঘুমন্ত চোখের কালো পক্ষ্মচ্ছায়া
পড়েছে পাণ্ডুর কপোলে।

ক্লান্ত জগৎ চলেছে পা টিপে'
ওর খোলা জানলার সামনে দিয়ে
ওর শান্তনিঃশ্বাসের ছন্দে।

ঘড়ির ইসারা
বধির ঘরে টিক্‌টিক্‌ করছে কোণের টেবিলে,
বাতাসে ঢুলছে দিনপঞ্জী দেয়ালের গায়ে।
চল্‌তি মুহূর্ত্তগুলি গতি হারাল ওর স্তব্ধ চেতনায়,
মিল্‌ল একটি অনিমেষ মুহূর্ত্তে
ছড়িয়ে দিল তার অশরীরী ডানা
ওর নিবিড় নিদ্রার 'পরে।

ওর ক্লান্ত দেহের করুণ মাধুরী মাটিতে মেলা,
যেন পূর্ণিমা-রাতের ঘুমহারানো অলস চাঁদ
সকালবেলায় শূন্য মাঠের শেষ সীমানায়।

পোষা বিড়াল দুধের দাবী স্মরণ করিয়ে
ডাক দিল ওর কানের কাছে।
চম্‌কে জেগে উঠে দেখল আমাকে,
তাড়াতাড়ি বুকে কাপড় টেনে
অভিমান ভরে বললে, "ছি, ছি,
কেন জাগালে না এতক্ষণ!"
কেন! আমি তার জবাব দিইনি ঠিকমতো।

যাকে খুব জানি তাকেও সব জানিনে
এই কথা ধরা পড়ে কোনো একটা আকস্মিকে।
হাসি আলাপ যখন আছে থেমে
মনে যখন থম্‌কে আছে প্রাণের হাওয়া
তখন সেই অব্যক্তের গভীরে
এ কী দেখা দিল আজ?
সে কি অস্তিত্বের সেই বিষাদ
যার তল মেলে না?

সে কি সেই বোবার প্রশ্ন
যার উত্তর লুকাচুরি করে রক্তে ?
সে কি সেই বিরহ
যার ইতিহাস নেই ?
সে কি অজানা বাঁশির ডাকে অচেনা পথে স্বপ্নে-চলা ?
ঘুমের স্বচ্ছ আকাশতলে
কোন্ নির্ব্বাক রহস্যের সামনে ওকে নীরবে সুধিয়েছি,
"কে তুমি ?
তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন্ লোকে ?"

সেদিন সকালে গলির ওপারে পাঠশালায়
ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ছিল নামতা ;
পাট-বোঝাই মোষের গাড়ি
চাকার ক্লিষ্টশব্দে নিংড়ে দিচ্ছিল বাতাসকে ;
ছাদ পিটচ্ছিল পাড়ার কোন্ বাড়িতে ;
জানলার নিচে বাগানে
চালতা গাছের তলায়
উচ্ছিষ্ট আমের আঁঠি নিয়ে
টানাটানি করছিল একটা কাক।
আজ এ সমস্তর উপরেই ছড়িয়ে পড়েছে
সেই দূরকালের মায়ারশ্মি।
ইতিহাসে বিলুপ্ত
তুচ্ছ এক মধ্যাহ্নের আলস্য-আবিষ্ট রৌদ্রে
এরা অপরূপের রসে রইল ঘিরে
অকাল ঘুমের একখানি ছবি।

১০ জুন, ১৯৩৬

কণি

আমরা ছিলেম প্রতিবেশী।
যখন-তখন ছুই বাসার সীমা ডিঙিয়ে
যা-খুসি ক'রে বেড়াত কণি,
খালি পা, খাটো ফ্রক্‌পরা মেয়ে ;
দুষ্টু চোখ ছুটো
যেন কালো আগুনের ফিন্‌কি-ছড়ানো।
ছিপ্‌ছিপে শরীর,
ঝাঁক্‌ড়া চুল চায় না শাসন মান্‌তে,
বেণী বাঁধতে মাকে পেতে হোত ছুঃখ।
সঙ্গে সঙ্গে সারাক্ষণ লাফিয়ে বেড়াত
কোঁক্‌ড়া লোমওয়ালা বেঁটে জাতের কুকুরটা,
ছন্দের মিলে বাঁধা
ছুজনে যেন একটি দ্বিপদী।

আমি ছিলেম ভালো ছেলে,
ক্লাসের দৃষ্টান্তস্থল।
আমার সেই শ্রেষ্ঠতার
কোনো দাম ছিল না ওর কাছে।
যে বছর প্রোমোশন পাই ছুক্লাস ডিঙিয়ে,
লাফিয়ে গিয়ে ওকে জানাই,
ও বলে —"ভারি তো,
কী বলিস টেমি ?"
ওর কুকুরটা ডেকে ওঠে—
"ঘেউ।"

ও ভালোবাস্‌ত হঠাৎ ভাঙতে আমার দেমাক,
কখিয়ে তুলতে ঠাণ্ডা ছেলেটাকে ;
যেমন ভালোবাস্‌ত
দম্ ক'রে ফাটিয়ে দিতে মাছের পট্‌কা।
ওকে জব্দ করার চেষ্টা
ঝরনার গায়ে নুড়ি-ছুঁড়ে-মারা।
কলকল হাসির ধারায়
বাধা দিত না কিছুতেই।

মুখস্থ করতে বসেছি সংস্কৃত শব্দরূপ
চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে,
ও হঠাৎ কখন দুম্ ক'রে
পিঠে মেরে গেল কিল
অত্যন্ত প্রাকৃত-রীতিতে।
সংস্কৃতের অপভ্রংশ
মুখ থেকে ভ্রষ্ট হবার পূর্ব্বেই
বেণীটুকুর দোলন দেখিয়ে দিল দৌড়।
মেয়ের হাতের সহাস্য অপমান
সহজে সম্ভোগ করবার বয়স
তখনো আমার ছিল অল্প দূরে।
তাই শাসনকর্ত্তা ছুটত ওর অনুসরণে,
প্রায় পৌঁছতে পারেনি লক্ষ্যে।
ওর বিলীয়মান শব্দভেদী হাসি
শুনেছি দূর থেকে,
হাতের কাছে পাইনি
কোনো দায়িত্ববিশিষ্ট জীব,
কোনো বেদনাবিশিষ্ট সত্তা।

এমনিতরো ছিল আমাদের আদ্যযুগ,
ছোটোমেয়ের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত।
দুরন্তকে শাসনের ইচ্ছা করেছি
পুরুষোচিত অসহিষ্ণুতায়;
শুনেছি ব্যর্থচেষ্টার জবাবে
তীব্রমধুর কণ্ঠে—
"দুয়ো দুয়ো দুয়ো।"
বাইরে থেকে হারের পরিমাণ
বেড়ে চলেছে যখন
তখন হয়তো জিৎ হয়েছে সুরু
ভিতর থেকে।
সেই বেতার বার্ত্তার কান খোলেনি তখনো,
যদিও প্রমাণ হচ্ছিল জড়ো।

ইতিমধ্যে আমাদের জীবননাট্যে
সাজ হয়েছে বদল।
ও পরেছে সাড়ি,
আঁচলে বিঁধিয়েছে ব্রোচ্,
বেণী জড়িয়েছে হাল ফেশানের খোঁপায়।
আমি ধরেছি খাকি রঙের খাটো প্যাণ্ট্,
আর খেলোয়াড়ের জামা
ফুট্‌বল-বলরামের নকলে।
ভিতরের দিকে ভাবের হাওয়ারও
বদল হোলো সুরু
কিছু তার পাওয়া যায় পরিচয়।

একদিন কণির বাবা পড়ছেন ব'সে
ইংরেজি সাপ্তাহিক।
বড়ো লোভ আমার ঐ ছবির কাগজটার 'পরে!
আমি লুকিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছি
উড়ো জাহাজের নক্সা।
জানতে পেরে তিনি উঠলেন হেসে।
তিনি ভাবতেন ছেলেটার বিদ্যার দম্ভ বেশি।
সেটা তাঁরও ছিল ব'লেই
আর কারো পারতেন না সইতে।
কাগজখানা তুলে' ধ'রে বললেন—
"বুঝিয়ে দাও তো বাপু এই ক'টা লাইন,
দেখি তোমার ইংরেজি বিদ্যে!"
নিষ্ঠুর অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে
মুখ লাল ক'রে উঠতে হোলো ঘেমে।
ঘরের এককোণে ব'সে
এক্‌লা করছিল কড়িখেলা,
আমার অপমানের সাক্ষী কণি।
দ্বিধা হোলো না পৃথিবী,
অবিচলিত রইল চারদিকের নির্ম্মম জগৎ।

পরদিন সকালে উঠে দেখি,
সেই কাগজখানা আমার টেবিলে।
শিবরামবাবুর ছবির কাগজ।
এত বড়ো দুঃসাহসের গভীর রসের উৎস কোথায়,
তার মূল্য কত,
সেদিন বুঝতে পারেনি বোকা ছেলে।

ভেবেছিলেম আমার কাছে কণির
এ শুধু স্পর্দ্ধার বড়াই।

দিনে দিনে বয়স বাড়ছে
আমাদেব দুজনেব অগোচরে,
তাব জন্যে দায়িক নই আমরা।
বয়স-বাড়াব মধ্যে অপরাধ আছে
এ কথা লক্ষ্য কবিনি নিজে,
কবেছেন শিববামবাবু।

আমাকে স্নেহ কবতেন কণিব মা,
তাব জবাবে ঝাঁজিয়ে উঠত তাঁব স্বামীব প্রতিবাদ।
একদিন আমাব চেহাবা নিয়ে খোঁটা দিয়ে
শিববামবাবু বলছিলেন তাঁব স্ত্রীকে—
—আমাব কানে গেল—
"টুক্‌টুকে আমেব মতো ছেলে,
পচতে কবে না দেবি,
ভিতবে পোকাব বাসা।"

আমাব 'পবে ওঁব ভাব দেখে
বাবা প্রায় বলতেন বেগে,—
"লক্ষ্মীছাড়া, কেন যাস্ ওদের বাড়ি!"
ধিক্কাব হোত মনে,
বলতেম দাঁত কাম্‌ড়ে,—
"যাব না আব কখ্‌খনো";

যেতে হোত দুদিন বাদেই
কুলতলার গলি দিয়ে লুকিয়ে।
মুখ বাঁকিয়ে বসে রইত কণি
দুদিন না-আসার অপরাধে।
হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ত,—
"আড়ি, আড়ি, আড়ি।"
আমি বল্‌তুম, "ভারী তো।"
ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাতুম আকাশের দিকে।

একদিন আমাদের দুই বাড়িতেই এল
বাসা ভাঙবার পালা।
এঞ্জিনিয়র শিবরামবাবু যাবেন পশ্চিমে
কোন্‌ সহরে আলো-জ্বালার কারবারে।
আমরা চলেছি কলকাতায়,
গ্রামের ইস্কুলটা নয় বাবার মনের মতো।
চলে যাবার দুদিন আগে
কণি এসে বললে, "এসো আমাদের বাগানে।"
আমি বললাম "কেন।"
কণি বললে, "চুরি করব দুজনে মিলে';
আর তো পাব না এমন দিন।"
বললেম, "কিন্তু তোমার বাবা —"
কণি বললে—"ভীতু!"
আমি বললেম মাথা বাঁকিয়ে—
"একটুও না।"

শিবরামবাবুর সখের বাগান ফলে আছে ভ'রে।
কণি সুধোলা, "কোন্ ফল ভালোবাসো সব চেয়ে।"
আমি বললেম, "ঐ মজঃফরপুরের লিচু।"
কণি বললে, "গাছে চ'ড়ে পাড়তে থাকো,
ধ'রে রইলেম ঝুড়ি।"
ঝুড়ি প্রায় ভরেছে,
হঠাৎ গর্জ্জন উঠল—"কেরে";
—স্বয়ং শিবরামবাবু!
বললেন, "আর কোনো বিদ্যা হবে না বাপু,
চুরি বিদ্যাই শেষ ভরসা।"
ঝুড়িটা নিয়ে গেলেন তিনি
পাছে ফলবান হয় পাপের চেষ্টা।
কণির দুই চোখ দিয়ে
মোটা মোটা ফোঁটায়
জল পড়তে লাগল নিঃশব্দে;
গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে
অমন অচঞ্চল কান্না
দেখিনি ওর কোনোদিন।

তারপরে মাঝখানে অনেকখানি ফাঁক।
বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি
কণির হয়েছে বিয়ে।
মাথায় উঠেছে লালপেড়ে আঁচল,
কপালে কুঙ্কুম,
শান্তগভীর চোখের দৃষ্টি,
স্বর হয়েছে গম্ভীর।

আমি কলকাতায় রসায়নের কারখানায়
ওষুধ বানিয়ে থাকি।
আমার দিনের পর দিন চলেছে
কর্ম্মচক্রের স্নেহহীন কর্কশধ্বনিতে।
একদিন কণির কাছ থেকে চিঠি এল,
দেখা করতে অনুনয়।
গ্রামের বাড়িতে ভাগ্নীর বিয়ে,
স্বামী পায়নি ছুটি,
ও একা এসেছে মায়ের কাছে।
বাবা গেছেন হুসিয়ারপুরে
বিবাহে মতবিরোধের আক্রোশে।

অনেকদিন পরে এসেছি গ্রামে,
এসেছি প্রতিবেশিনীর সেই বাড়িতে।
ঘাটের পাশে ঢালুপাড়িতে
ঝুঁকে রয়েছে সেই হিজল গাছ জলের দিকে,
পুকুর থেকে আসছে
সেই পুরোনো কালের মিষ্টিগন্ধ শ্যাওলার;
আর সিসুগাছের ডালে ঝুলছে
সেই দোলাটা আজও।

কণি প্রণাম ক'রে বললে, "অমলদাদা,
থাকি দূর দেশে,
ভাইফোঁটার দিনে পাব তোমায় নেই সে আশা।
আজ অদিনে মেটাব আমার সাধ তাই ডেকেছি।"

বাগানে আসন পড়েছে অশথতলার চাতালে।
অনুষ্ঠান হোলো সারা ;
পায়ের কাছে কণি রাখলে একটি ঝুড়ি,
সে ঝুড়ি লিচুতে ভরা।
বললে—"সেই লিচু !"
আমি বললেম—"ঠিক সে লিচু নয় বুঝি,"
কণি বললে—"কী জানি।"
—বলেই দ্রুত গেল চলে।

১২ জুন, ১৯৩৬

বাঁশিওয়ালা

"ওগো বাঁশিওয়ালা,
বাজাও তোমার বাঁশি,
শুনি আমার নূতন নাম,"
—এই ব'লে তোমাকে প্রথম চিঠি লিখেছি,
মনে আছে তো ?

আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।
সৃষ্টিকর্তা পুরো সময় দেননি
আমাকে মানুষ ক'রে গড়তে,—
রেখেছেন আধাআধি ক'রে।
অন্তরে বাহিরে মিল হয়নি
সেকালে আর আজকের কালে,
মিল হয়নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে,
মিল হয়নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়।
আমাকে তুলে দেননি এ যুগের পারানি নৌকোয়,
চলা আটক ক'রে ফেলে রেখেছেন
কালস্রোতের ওপারে বালুডাঙায়।
সেখান থেকে দেখি
প্রখর আলোয় ঝাপ্‌সা দূরের জগৎ,
বিনা কারণে কাঙাল মন অধীর হয়ে ওঠে,
দুই হাত বাড়িয়ে দিই,
নাগাল পাইনে কিছুই কোনোদিকে।

বেলা তো কাটে না,
বসে থাকি জোয়ারজলের দিকে চেয়ে,
ভেসে যায় মুক্তি-পারের খেয়া,
ভেসে যায় ধনপতির ডিঙা,
ভেসে যায় চল্‌তি-বেলার আলোছায়া।
এমন সময় বাজে তোমার বাঁশি
ভরা জীবনের সুরে।
মরা দিনের নাড়ীর মধ্যে
দব্‌দবিয়ে ফিরে আসে প্রাণের বেগ।

কী বাজাও তুমি,
জানিনে সে সুর জাগায় কার মনে কী ব্যথা।
বুঝি বাজাও পঞ্চমরাগে
দক্ষিণ হাওয়ার নবযৌবনের ভাটিয়ারি।
শুন্‌তে শুন্‌তে নিজেকে মনে হয়,
যে ছিল পাহাড়তলীর ঝির্‌ঝিরে নদী,
তার বুকে হঠাৎ উঠেছে ঘনিয়ে
শ্রাবণের বাদলরাত্রি।
সকালে উঠে দেখা যায় পাড়ি গেছে ভেসে,
একগুঁয়ে পাথরগুলোকে ঠেলা দিচ্চে
অসহ্য স্রোতের ঘূর্ণি-মাতন।

আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক,
আগুনের ডাক,—
পাঁজরের উপরে আছাড়-খাওয়া

মরণ-সাগরের ডাক,
ঘরের শিকল-নাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক।
যেন হাঁক দিয়ে আসে
অপূর্ণের সঙ্কীর্ণ খাদে
পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি,
ছিনিয়ে নেবে, ভাসিয়ে দেবে বুঝি।
অঙ্গে অঙ্গে পাক দিয়ে ওঠে
কালবৈশাখীর ঘূর্ণি-মার-খাওয়া
অরণ্যের বকুনি।
ডানা দেয়নি বিধাতা,
তোমার গান দিয়েছে আমার স্বপ্নে
ঝোড়ো আকাশে উড়ো প্রাণের পাগলামী।

ঘরে কাজ করি শান্ত হয়ে ;
সবাই বলে ভালো।
তা'রা দেখে আমার ইচ্ছার নেই জোর,
সাড়া নেই লোভের,
ঝাপট লাগে মাথার উপর,
ধূলোয় লুটোই মাথা।
দুরন্ত ঠেলায় নিষেধের পাহারা কাৎ ক'রে ফেলি
নেই এমন বুকের পাটা ;
কঠিন ক'রে জানিনে ভালোবাসতে,
কাঁদতে শুধু জানি,
জানি এলিয়ে পড়তে পায়ে।

বাঁশিওয়ালা,
বেজে ওঠে তোমার বাঁশি,—

ডাক পড়ে অমর্ত্ত্যলোকে ;
সেখানে আপন গরিমায়
উপরে উঠেছে আমার মাথা।
সেখানে কুয়াশার পর্দ্দা-ছেঁড়া
তরুণ-সূর্য্য আমার জীবন।
সেখানে আগুনের ডানা মেলে দেয়
আমার বারণ-না-মানা আগ্রহ,
উড়ে চলে অজানা শূন্য পথে
প্রথম ক্ষুধায় অস্থির গরুড়ের মতো।
জেগে ওঠে বিদ্রোহিণী,
তীক্ষ্ণ চোখের আড়ে জানায় ঘৃণা
চারদিকের ভীরুর ভীড়কে ;
কৃশ কুটিলেব কাপুরুষতাকে।

বাঁশিওয়ালা,
হয়তো আমাকে দেখতে চেয়েছ তুমি।
জানিনে, ঠিক জায়গাটি কোথায়,
ঠিক সময় কখন,
চিনবে কেমন ক'রে।
দোসর-হারা আষাঢ়ের ঝিল্লিঝনক রাত্রে
সেই নারী তো ছায়ারূপে
গেছে তোমার অভিসারে
চোখ-এড়ানো পথে।
সেই অজানাকে কত বসন্তে
পরিয়েছ ছন্দের মালা,
শুকোবে না তা'র ফুল।

তোমার ডাক শুনে' একদিন
ঘরপোষা নির্জ্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোণ থেকে
বেরিয়ে এল ঘোমটা-খসা নারী।
যেন সে হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির,
চমক লাগালো তোমাকেই।
সে নাম্‌বে না গানের আসন থেকে ;
সে লিখবে তোমাকে চিঠি,
রাগিণীর আবছায়ায় ব'সে।
তুমি জান্‌বে না তার ঠিকানা।

ওগো বাঁশিওয়ালা,—
সে থাক্‌ তোমার বাঁশির সুরের দূরত্বে।

১৬ জুন, ১৯৩৬

মিল-ভাঙা

এসেছিলে কাঁচা জীবনের
পেলব রূপটি নিয়ে,
এনেছিলে আমার হৃদয়ের প্রথম বিস্ময়,
রক্তে প্রথম কোটালের বান।
আধোচেনার ভালোবাসার মাধুরী
ছিল যেন ভোরবেলাকার
কালো ঘোমটায় সূক্ষ্ম সোনার কাজ,
গোপন শুভদৃষ্টির আবরণ।
মনের মধ্যে তখনো
অসংশয় হয়নি পাখীর কাকলী;
বনের মর্ম্মর একবার জাগে
একবার যায় মিলিয়ে।

বহুলোকের সংসারের মাঝখানে
চুপিচুপি তৈরি হোতে লাগল
আমাদের দু জনের নিভৃত জগৎ।
পাখী যেমন প্রতিদিন
খড়কুটো কুড়িয়ে এনে বাসা বাঁধে,
তেমনি সেই জগতের উপকরণ সামান্য,
চল্‌তি মুহূর্ত্তের খ'সে-পড়া
উড়ে-আসা সঞ্চয় দিয়ে গাঁথা।
তার মূল্য ছিল তার রচনায়,
নয় তার বস্তুতে।

শেষে একদিন দুজনের নৌকো-বাওয়া থেকে
কখন একলা গেছ নেমে ;
আমি ভেসে চলেছি স্রোতে,
তুমি বসে রইলে ওপারের ডাঙায়।
মিল্‌ল না আর আমার হাতে তোমার হাতে
কাজে কিম্বা খেলায়।
জোড় ভেঙে ভাঙল আমাদের জীবনের গাঁথনি।
যে দ্বীপের শ্যামল ছবিখানি সদ্য আঁকা পড়েছে
সমুদ্রের লীলাচঞ্চল তরঙ্গপটে
তাকে যেমন দেয় মুছে
এক জোয়ারের তুমুল তুফানে
তেমনি মিলিয়ে গেল আমাদের কাঁচা জগৎ
সুখদুঃখের নতুন-অঙ্কুর-মেলা
শ্যামল রূপ নিয়ে।

তারপরে অনেক দিন গেছে কেটে।
আষাঢ়ের আসন্নবর্ষণ সন্ধ্যায়
যখন তোমাকে দেখি মনে মনে,
দেখতে পাই তুমি আছ
সেইদিনকাব কচি যৌবনের মায়া দিয়ে ঘেরা।
তোমার বয়স গেছে থেমে।
তোমার সেই বসন্তের আমের বোলে
আজো তেমনি গন্ধেরই ঘোষণা,
তোমার সেদিনকার মধ্যাহ্ন
আজ মধ্যাহ্নেও ঘুঘুর ডাকে তেমনি বিরহাতুর।

আমার কাছে তোমার স্মরণ রয়ে গেছে
প্রকৃতির বয়সহারা এই সব পরিচয়ের দলে।
সুন্দর তুমি বাঁধা রেখায়,
প্রতিষ্ঠিত তুমি অচল ভূমিতে।

আমার জীবনধারা
কোথাও রইল না থেমে।
দুর্গমের মধ্যে গভীরের মধ্যে
মন্দ ভালোর দ্বন্দ্ব বিরোধে,
চিন্তায় সাধনায় আকাঙ্ক্ষায়,
কখনো সফলতায়, কখনো প্রমাদে
চলে এসেছি তোমার জানা সীমার
বহুদূর বাইরে ;
সেখানে আমি তোমার কাছে বিদেশী।
সেই তুমি আজ এই মেঘ-ডাকা সন্ধ্যায়
যদি এসে বোসো আমার সামনে,
দেখতে পাবে আমার চোখে
দিক-হারানো চাহনি,
অজানা আকাশের সমুদ্রপারে
নীল অরণ্যের পথে।

তুমি কি পাশে বসে শোনাবে
সেদিনকার কানে-কানে কথার উদ্বৃত্ত ?
কিন্তু ঢেউ করছে গর্জ্জন,
শকুন করছে চীৎকার,

মেঘ ডাকছে আকাশে,
মাথা নাড়ছে নিবিড় শালের বন।
তোমার বাণী হবে খেলার ভেলা
ক্ষেপাজলের ঘূর্ণিপাকে।

সেদিন আমার সব মন
মিলেছিল তোমার সব মনে,
তাই প্রকাশ পেয়েছে নূতন গান
প্রথম সৃষ্টির আনন্দে।
মনে হয়েছে
বহুযুগের আশ মিটল তোমাতে আমাতে।
সেদিন প্রতিদিনই বয়ে এনেছে
নূতন আলোর আগমনী,
আদিকালে সত্য-চোখ-মেলা তারার মতো।

আজ আমার যন্ত্রে
তার চড়েছে বহুশত,
কোনোটা নয় তোমার জানা।
যে সুর সেধে রেখেছ সেদিন
সে সুর লজ্জা পাবে এর তারে।
সেদিন যা ছিল ভাবের লেখা
আজ হবে তা দাগা-বুলোনো।

তবু জল আসে চোখে।
এই সেতারে নেমেছিল তোমার আঙুলের
প্রথম দরদ;
এর মধ্যে আছে তা'র জাদু,
এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে
কিশোর বয়সের শ্যামল পারের থেকে।
এর মধ্যে আছে তা'র বেগ।
আজ মাঝনদীতে সারিগান গাইব যখন
তোমার নাম পড়বে বাঁধা
তা'র হঠাৎ তানে।

২০ জুন, ১৯৩৬

হঠাৎ-দেখা

রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা,
ভাবিনি সম্ভব হবে কোনোদিন।

আগে ওকে বারবার দেখেছি
লালরঙের সাড়িতে
দালিম ফুলের মতো রাঙা ;
আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড়,
আঁচল তুলেছে মাথায়,
দোলনচাঁপার মতো চিকনগৌর মুখখানি ঘিরে'।
মনে হোলো কালো রঙে একটা গভীর দূরত্ব
ঘনিয়ে নিয়েছে নিজের চারদিকে,
যে দূরত্ব শর্ষেক্ষেতের শেষ সীমানায়
শালবনের নীলাঞ্জনে।
থম্‌কে গেল আমার সমস্ত মনটা ;
চেনা লোককে দেখলেম অচেনার গাম্ভীর্য্যে।
হঠাৎ খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে
আমাকে করলে নমস্কার।
সমাজবিধির পথ গেল খুলে ;
আলাপ করলেম সুরু,—
কেমন আছ, কেমন চলছে সংসার
ইত্যাদি।

সে রইল জানলার বাইরের দিকে চেয়ে,
যেন কাছের দিনের ছোঁয়াচ-পার-হওয়া চাহনিতে।
দিলে অত্যন্ত ছোটো দুটো-একটা জবাব,
কোনোটা বা দিলেই না।
বুঝিয়ে দিলে হাতের অস্থিরতায়,
কেন এ সব কথা,
এর চেয়ে অনেক ভালো চুপ ক'রে থাকা।

আমি ছিলেম অন্য বেঞ্চিতে
ওর সাথীদের সঙ্গে।
এক সময়ে আঙুল নেড়ে জানালে কাছে আসতে।
মনে হোলো কম সাহস নয়;
বসলুম ওর এক-বেঞ্চিতে।
গাড়ির আওয়াজের আড়ালে
বললে মৃদুস্বরে,—
"কিছু মনে কোরো না,
সময় কোথা সময় নষ্ট করবার?
আমাকে নামতে হবে পরের ষ্টেশনেই;
দূরে যাবে তুমি,
দেখা হবে না আর কোনোদিনই।
তাই যে প্রশ্নটার জবাব এতকাল থেমে আছে,
শুনব তোমার মুখে।
সত্য ক'রে বলবে তো?"

আমি বললেম,—"বলব।"

বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েই সুধোলো,—

"আমাদের গেছে যে দিন,

একেবারেই কি গেছে,

কিছুই কি নেই বাকি?"

একটুকু রইলেম চুপ ক'রে;

তারপর বললেম—

"রাতের সব তারাই আছে

দিনের আলোর গভীরে।"

খট্‌কা লাগল, কী জানি বানিয়ে বললেম না কি?

ও বললে, "থাক্‌, এখন যাও ওদিকে।"

সবাই নেমে গেল পরের ষ্টেশনে;

আমি চললেম একা।—

২৪ জুন, ১৯৩৬

কালরাত্রে

কালরাত্রে
বাদলের দানোয়-পাওয়া অন্ধকারে
বর্ষণের রিম্‌ঝিম্ প্রলাপে
চাপা দিয়েছিল
সন্ন্যাসী নিশীথের ধ্যানমন্ত্র।
জড়ত্বে ছিলেম পরাভূত,
ছিলেম উপবাসী ;
ছিল শিথিলশক্তি ধূলিশয়ান।
বুকে ভর দিয়ে বসেছিল
সমস্ত আকাশের সঙ্গহীনতা।
"চাই চাই" ক'রে কেঁদে উঠেছিল প্রাণ
প্রহরে প্রহরে নিশাচর পাখীর মতো।
নানা নাম ধরেছিল ভিক্ষা,
অন্তরের অন্ধস্তরে শিকড় চালিয়েছিল
আঁকাবাঁকা অশুচি কান্নার।
"চাই চাই" ব'লে
শূন্যে হাৎড়ে বেড়িয়েছিল রাত-কানা
যাকে চায় তাকে না জেনে।
শেষে ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে হেঁকে উঠল—
নেই সে নেই কোথাও নেই।

সত্যহারা শূন্যতার গর্ত্ত থেকে
কালো কামনার সাপের বংশ
বেরিয়ে এসে জড়িয়েছে কাঙালকে
নাস্তিত্বের সেই শিকলবাঁধা ভৃত্যকে,
নিরর্থের বোঝায়
বেঁকেছে যার পিঠ
নেমেছে যার মাথা।

ভোর হোলো রাত্রি।
আষাঢ়ের সকালে অকস্মাৎ হাওয়ায়
ঘন মেঘের দুর্গ-প্রাচীর
পড়ল ভেঙেচুরে।
ছুটে বেরিয়ে এসেছে
প্রভাতের বাঁধন-ছেঁড়া আলো।
মুক্তির আনন্দ-ঘোষণা
বেজে উঠল আকাশে আকাশে
আগুনের ভাষায়।
পাখীদের ছোটো কোমলতনুতে
দুরন্ত হয়ে উঠল প্রাণের উৎসুক ছন্দ।
চল্‌ল তাদের সুরের তীরখেলা
কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে, শাখা থেকে শাখায়।
সেতারের দ্রুততালের বাজন, যেন
পাতায় পাতায় আলোর চমক।
মন দাঁড়িয়ে উঠল
বললে, আমি পূর্ণ।
তার অভিষেক হোলো
আপনারি উদ্বেল তরঙ্গে।

তার আপন সঙ্গ
আপনাকে করলে বেষ্টন
শিলাতটকে ঝরনার মতো ;—
উপ্‌ছে উঠে' মিলতে চল্‌ল
চারদিকের সব-কিছুর মধ্যে।
চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।
প্রভাত-সূর্য্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ ;
ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া,
পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা,
গান গাইলেম—"চাইনে কিছু চাইনে ;"
যেমন গাইছে রক্তপদ্মের রক্তিমা,
যেমন গাইছে সমুদ্রের ঢেউ,
সন্ধ্যাতারার শান্তি,
গিরিশিখরের নির্জ্জনতা।

২৩ জুন, ১৯৩৬

অমৃত

বিদায় নিয়ে চ'লে আসবার বেলা বললেম তাকে,
"ভারতে একজন নারী বলেছিলেন একদিন,—
উপকরণ চান না তিনি,
তিনি চান অমৃত।
এই তো নারীর পণ ,
তুমি কী বলো ?"
অমিয়া হাসল একটু বিবস হাসি,
বললে, "এ কি উপদেশ ?"
আমি বললেম তার হাত চেপে ধ'রে,
"ভালোবাসাই সেই অমৃত,
উপকবণ তাব কাছে তুচ্ছ
বুঝবে একদিন।"

বিরক্ত হোলো অমিয়া,
বললে, "তুমি কেন নিয়ে গেলে না আমাকে মিথ্যে থেকে ?
জোর নেই কেন তোমার ?"
আমি বললেম, "বাধে আত্মগৌরবে।
যতদিন না ধনে হব সমান
আসব না তোমার কাছে।"
অমিয়া মাথা-ঝাকানি দিয়ে উঠে দাঁড়াল,
চলল ঘরেব বাইরে।

আমি বললেম, "শুনে রাখো,
তোমার ভালোবাসার বদলে
দেব না তোমাকে অকিঞ্চনের অসম্মান।
এই আমার পুরুষের পণ।"

দিন যায় রাত যায়,
মাথায় চ'ড়ে ওঠে সোনার মদের নেশা।
সঞ্চয়েব ধাক্কা যতই বাড়ে
ততই আমাকে চলে ঠেলে।
থাম্‌তে পারিনে, থামাতে পারিনে তার তাড়না।
বিত্ত বাড়ে, খ্যাতি বাড়ে,
বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলে আত্মশ্লাঘা।
শেষে ডাক্তার বললে বিশ্রাম চাই নিতান্তই,
দেহের কল অচল হয়ে এল ব'লে।

গেলেম দূরদেশে নির্জ্জনে।
সেখানে সমুদ্রের একটা খাড়ি এসে মিলেছে
পাহাড়তলীর অরণ্যে।
ভিড় জমেছে গাছে গাছে
মাছধরা পাখীদের পাড়ায়।
ক্ষীণ নদীটি ঝরে পড়ছে পাহাড় থেকে
পাথরের ধাপে ধাপে।
নুড়ি ডিঙিয়ে বেঁকে-চলা
তার ফটিকজলের কলকলানি
ধরিয়ে রেখেছে একটি মূল সুর নির্জ্জনতার।

নিত্য-স্নান-করা সেখানকার হাওয়া
চলেছে মন্ত্র গুনগুনিয়ে বনের থেকে বনে।
দল বেঁধেছে নারকেল গাছ
কেউ খাড়া, কেউ হেলে-পড়া,
দিনরাত ওদের ঝালর-ঝোলা অস্থিরপনা।
ফিরে ফিরে আছাড় খেয়ে ফেনিয়ে উঠছে ঢেউ
মোটা মোটা কালো পাথরে।
ডাঙায় ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্চে
ঝিনুক শামুক শ্যাওলা।
ক্লান্ত শরীর ব্যস্ত মনকে ফিরিয়েছে
শান্ত রক্তধারার স্নিগ্ধতায়।
কর্ম্মের নেশার ঝাঁজ এল ম'রে।
এতকালের খাটুনি মনে হোলো যেন স্বপ্ন,
প্রাণ উঠল দুহাত বাড়িয়ে
জীবনের সাঁচ্চা সোনার জন্যে।

সেদিন ঢেউ ছিল না জলে।
আশ্বিনের রোদ্দুর কাঁপছে
সমুদ্রের শিহর-লাগা গায়ে।
বাসার ধারে পুরোনো ঝাউগাছে
ধেয়ে আসছে খাপছাড়া হাওয়া,
ঝরঝর ক'রে উঠছে তার পাতা।
বেগ্‌নি রঙের পাখী, বুকের কাছে সাদা,
টেলিগ্রাফের তারে ব'সে ল্যাজ দুলিয়ে
ডাক্‌ছে মিষ্টি মৃদু চাপা সুরে।

শরৎ আকাশের নির্ম্মল-নীলে ছড়িয়ে আছে
কোন্ অনাদি নির্ব্বাসনের গভীর বিষাদ।
মনের মধ্যে হুহু ক'রে উঠছে—
"ফিরে যেতে হবে।"
থেকে থেকে মনে পড়ছে
সেদিনকার সেই জল-মুছে-ফেলা চোখে
ঝ'লে উঠেছিল যে আলো।
সেইদিনই চড়লুম জাহাজে।
বন্দরে নেমেই এসেছি চ'লে।
রাস্তার বাঁকে এসে চাইলেম বাড়ির দিকে;
মনে হোলো সেখানে বাস নেই কারো।
এলেম সদর দরজার সামনে,
দেখি তালা বন্ধ।
ধক্ ক'রে উঠল বুকের মধ্যে;
বাড়ির ভিতর থেকে শূন্যতার দীর্ঘনিঃশ্বাস এসে
লাগল আমার অন্তরে।

অনেক সন্ধানের পর
দেখা হোলো শেষে;
কোন্ বারো-ভুঁইঞাদের আমলের
একখানা তিনকাল-পেরোনো গ্রাম,
একটি পুরোনো দীঘির ধারে;
দীঘির নামেই লোচনদীঘি তার নাম।
সেখানে ভুলে-যাওয়া তারিখের
ঝাপ্সা অক্ষরপটওয়ালা
ভাঙা দেবালয়।

পূর্ব্বখ্যাতির কোনো সাক্ষী রাখেনি,
আছে সে অশ্বত্থের পাঁজরভাঙা
আলিঙ্গনে জড়িয়ে-পড়া।
পাড়ির উপরে বুড়ো বটের তলায়
একটি নূতন আটচালা ঘর,
সেইখানে গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয়।

দেখলুম অমিয়াকে,
ছাইরঙের মোটা সাড়িপরা,
দুই হাতে দুই গাছি শাঁখা,
পায়ে নেই জুতো ;
ঢিলে খোঁপা অযত্নে পড়েছে ঝুলে।
পাড়াগাঁয়ের শ্যামল রঙ লেগেছে মুখে।
ছোটো ঝারি-হাতে পাঠশালার বাগানে
জল দিচ্চে সব্‌জি ক্ষেতে।
ভেবে পেলেম না কী বলি।
তারো মুখে এল না
প্রথম-দেখার কোনো সম্ভাষণ,
কোনো প্রশ্ন।
চোখের আড়ে
আমার দামী জুতোজোড়াটার দিকে তাকিয়ে
বললে অনায়াসে,—
"বেশি বর্ষায় আগাছায় চাপা পড়েছে
বিলিতি বেগুনের চারা ;
এসো না, নিড়িয়ে দেবে।"

বোঝা গেল না, ঠাট্টা কি সত্যি।
জামার আস্তিনে ছিল মুক্তোর বোতাম,
লুকিয়ে আস্তিনটা দিলাম উল্‌টিয়ে,
অমিয়ার জন্যে একটা ব্রোচ্‌ ছিল পকেটে,
বুঝলেম দিতে গেলে
হীরেটাতে লাগ্‌বে প্রহসনের হাসি।
একটু কেশে সুধালেম
"এখানে থাকো কোথায় ?"
ঝারি রেখে দিয়ে বললে, "দেখবে ?"
নিয়ে গেল স্কুলের মধ্যে,
দালানের পুব দিকটাতে
সতরঞ্চের পর্দ্দা দিয়ে ভাগ-করা ঘরে।
একটা তক্তপোষের উপর
বিছানা রয়েছে গোটানো।

টুলের উপর সেলাইয়ের কল,
ছিটের খাপে-ঢাকা সেতার
দেয়ালে ঠেসান-দেওয়া।
দক্ষিণের দরজার সামনে মাদুর পাতা,
তার উপরে ছড়িয়ে আছে
ছাঁটা কাপড়, নানা রঙের ফিতে,
রেশমের মোড়ক।
উত্তর কোণের দেয়ালে
ছোটো টিপায়ে হাত-আয়না,
চিরুণি, তেলের শিশি,
বেতের ঝুড়িতে টুকিটাকি।

দক্ষিণ কোণের দেয়ালের গায়ে
ছোটো টেবিলে লেখবার সামগ্রী,
আর রং-করা মাটির ভাঁড়ে
একটি স্থলপদ্ম।
অমিয়া বললে, "এই আমার বাসা,
একটু বোসো, আসছি আমি।"

বাইরে জটা-ঝোলা বটের ডালে
ডাক্‌ছে কোকিল।
মানকচুর ঝোপের পাশে
বিষম ক্ষেপে উঠেছে একদল ঝগড়াটে শালিখ।
দেখা যায় ঝিলমিল করছে
ঢালুপাড়ির তলায়
দীঘির উত্তর ধারের একটুক্‌রো জল,
কল্‌মি শাকের পাড়-দেওয়া।
চোখে পড়ল, লেখবার টেবিলে একটি ছবি,
অল্প বয়সের যুবা, চিনিনে তাকে ;—
কয়লায় আঁকা, কাঁচকড়ার ফ্রেমে বাঁধানো,—
ফলাও তার কপাল, চুল আলুথালু,
চোখে যেন দূর ভবিষ্যের আলো,
ঠোঁটে যেন কঠিন পণ তালা-আটা।
এমন সময় অমিয়া নিয়ে এল,
থালায় ক'রে জলখাবার,—
চিঁড়ে, কলা, নারকেল নাড়ু,
কালো পাথরবাটিতে দুধ,
এক গেলাস ডাবের জল।

মেঝের উপর থালা রেখে
পশমে-বোনা একটা আসন দিল পেতে।
ক্ষিদে নেই বললে মিথ্যে হোত না,
রুচি নেই বললে সত্য হোত,
কিন্তু খেতেই হোলো।
তারপরে শোনা গেল খবর।

আমার ব্যবসায়ে আমদানি যখন জমে উঠছে ব্যাঙ্কে,
যখন হুঁস ছিল না আর কোনো জমাখরচে,
তখন অমিয়ার বাবা কুঞ্জকিশোরবাবু
মাঝে মাঝে লক্ষপতির ঘরের
দুর্লভ দুই একটি ছেলেকে
এনেছিলেন চায়ের টেবিলে।
সব সুযোগই ব্যর্থ করেছে বারেবারে
তাঁর একগুঁয়ে মেয়ে।
কপাল চাপ্‌ড়ে, হাল ছেড়েছেন যখন তিনি,
এমন সময় পারিবারিক দিগন্তে
হঠাৎ দেখা দিল কক্ষছাড়া পাগ্‌লা জ্যোতিষ্ক,
মাধপাড়ার রায়বাহাদুরের একমাত্র ছেলে মহীভূষণ।
রায়বাহাদুর জমা টাকা আর জমাট বুদ্ধিতে
দেশবিখ্যাত।
তাঁর ছেলেকে কোনো কন্যার পিতা পারে না হেলা করতে
যতই সে হোক্ লাগাম-ছেঁড়া।
আট বছর য়ুরোপে কাটিয়ে মহীভূষণ ফিরেছেন দেশে।
বাবা বললেন, "বিষয়কর্ম্ম দেখো।"
ছেলে বললে, "কী হবে।"

লোকে বললে, ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে
রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাহুড়টা।
অমিয়ার বাবা বললেন, "ভয় নেই,
নরম হয়ে এল ব'লে দেশের ভিজে হাওয়ায়।"
ছুদিনে অমিয়া হোলো তার চেলা।
যখন-তখন আসত মহীভূষণ,
আশপাশের হাসাহাসি কানাকানি গায়ে লাগ্‌ত না কিছুই।

দিনের পর দিন যায়।
অধীর হয়ে অমিয়ার বাবা তুললেন বিয়ের কথা।
মহী বললে—"কী হবে!"
বাবা রেগে বললেন, "তবে তুমি আসো কেন রোজ?"
অনায়াসে বললে মহীভূষণ,
"অমিয়াকে নিয়ে যেতে চাই যেখানে ওর কাজ।"

অমিয়ার শেষ কথা এই—
"এসেছি তাঁরি কাজে।
উপকরণের ছুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার।"
আমি সুধালেম, "কোথায় আছেন তিনি?"
অমিয়া বললে—"জেলখানায়।"

৩ জুলাই, ১৯৩৬

দুর্ব্বোধ

অধ্যাপকমশায় বোঝাতে গেলেন নাটকটার অর্থ,
সেটা হয়ে উঠল বোধের অতীত।
আমার সেই নাটকের কথা বলি ;—

বইটার নাম 'পত্রলেখা',
নায়ক তার কুশলসেন।
নবনীর কাছে বিদায় নিয়ে সে গেল বিলেতে।
চার বছর পরে ফিরে এসে হবে বিয়ে।
নবনী কাঁদল উপুড় হয়ে বিছানায়,
তার মনে হোলো, এ যেন চার বছরের মৃত্যুদণ্ড।

নবনীকে কুশলের প্রয়োজন ছিল না ভালোবাসার পথে,
প্রয়োজন ছিল সুগম করতে বিলাতযাত্রার পথ।
সে কথা জানত নবনী,
সে পণ করেছিল হৃদয় জয় করবে প্রাণপণ সাধনায়।
কুশল মাঝে মাঝে
রুচিতে বুদ্ধিতে উঁচট খেয়ে ওকে হঠাৎ বলেছে রূঢ় কথা,
ও সয়েছে চুপ ক'রে ;
মেনে নিয়েছে নিজেকে অযোগ্য ব'লে ;
ওর নালিশ নিজেরই উপরে।
ভেবেছিল দীনা ব'লেই একদিন হবে ওর জয়,
ঘাস যেমন দিনে দিনে নেয় ঘিরে কঠোর পাহাড়কে।

এ যেন ছিল ওর ভালোবাসার শিল্পরচনা,
নির্দ্দয় পাথরটাকে ভেঙে ভেঙে রূপ আবাহন করা
ব্যথিত বক্ষের নিরন্তর আঘাতে।
আজ নবনীর সেই দিনরাতের আরাধনার ধন গেল দূরে।
ওর দুঃখের থালিটি ছিল অশ্রুভেজা অর্ঘ্যে ভরা,
আজ থেকে দুঃখ রইবে কিন্তু দুঃখের নৈবেদ্য রইবে না।
এখন ওদের সম্বন্ধের পথ রইল
শুধু এপারে ওপারে চিঠিলেখার সাঁকো বেয়ে।
কিন্তু নবনী তো সাজিয়ে লিখতে জানে না মনের কথা,
ও কেবল যত্নের স্বাদ লাগাতে জানে সেবাতে,
অর্‌কিডের চমক দিয়ে যেতে ফুলদানির পরে
কুশলের চোখের আড়ালে;
গোপনে বিছিয়ে আসতে
নিজের হাতে কাজ-করা আসন
যেখানে কুশল পা রাখে।

কুশল ফিরল দেশে,
বিয়ের দিন করল স্থির।
আঙটি এনেছে বিলেত থেকে
গেল সেটা পরাতে;
গিয়ে দেখে ঠিকানা না রেখেই নবনী নিরুদ্দেশ।
তার ডায়ারিতে আছে লেখা,
"যাকে ভালোবেসেছি সে ছিল অন্য মানুষ,
চিঠিতে যার প্রকাশ, এ তো সে নয়।"

এদিকে কুশলের বিশ্বাস
তার চিঠিগুলি গদ্যে মেঘদূত,
বিরহীদের চিরসম্পদ।
আজ সে হারিয়েছে প্রিয়াকে
কিন্তু মন গেল না চিঠিগুলি হারাতে,
ওর মমতাজ পালাল, রইল তাজমহল।
নাম লুকিয়ে ছাপালো চিঠি "উদ্ভ্রান্তপ্রেমিক" আখ্যা দিয়ে।

নবনীর চরিত্র নিয়ে
বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা হয়েছে বিস্তর।
কেউ বলেছে বাঙালির মেয়েকে
লেখক এগিয়ে নিয়ে চলেছে
ইবসেনের মুক্তিবাণীর দিকে,
কেউ বলেছে রসাতলে।

অনেকে এসেছে আমার কাছে জিজ্ঞাসা নিয়ে;
আমি বলেছি, "আমি কী জানি!"
বলেছি, "শাস্ত্রে বলে, দেবা ন জানন্তি।"
পাঠকবন্ধু বলেছে,
"নারীর প্রসঙ্গে না হয় চুপ করলেম
হতবুদ্ধি দেবতারই মতো,
কিন্তু পুরুষ?
তারো কি অজ্ঞাতবাস চিররহস্যে?
ও মানুষটা হঠাৎ পোষ মান্‌লে কোন্ মন্ত্রে?"
আমি বলেছি—
"মেয়েই হোক্ আর পুরুষই হোক্, স্পষ্ট নয় কোনো পক্ষই;

যেটুকু সুখ বা দুঃখ দেয় স্পষ্ট কেবল সেইটুকুই।
প্রশ্ন কোরো না।
পড়ে দেখো কী বল্‌ছে কুশল।—

কুশল বলে, "নবনী চার বছর ছিল দৃষ্টির বাইরে,
যেন নেমে গেল সৃষ্টির বাইরেতেই ;
ওর মাধুর্য্যটুকুই রইল মনে,
আর সব-কিছু হোলো গৌণ।
সহজ হয়েছে ওকে সুন্দর ছাঁদে চিঠি লিখতে।
অভাব হয়েছে, করেছি দাবী,
ওর ভালোবাসার উপর অবাধ ভরসা
মনকে করেছে রসসিক্ত, করেছে গর্ব্বিত।
প্রত্যেক চিঠিতে আপন ভাষায় ভুলিয়েছি আপনারই মন।
লেখার উত্তাপে ঢালাই-করা অলঙ্কার
ওর স্মৃতির মূর্ত্তিটিকে সাজিয়ে তুলেছে দেবীর মতো।
ও হয়েছে নূতন রচনা।
এই জন্যেই খৃষ্টান শাস্ত্রে বলে,—
"সৃষ্টির আদিতে ছিল বাণী।"
পাঠকবন্ধু আবার জিগেস করেছে
"ও কি সত্য বল্‌লে,
না, এটা নাটকের নায়কগিরি ?"
আমি বলেছি-"আমি কী জানি।"

৫ জুলাই, ১৯৩৬

বঞ্চিত

(১)

ফুলিদের বাড়ি থেকে এসেই দেখি
পোষ্টকার্ডখানা আয়নার সামনেই,
কখন এসেছে জানিনে তো।
মনে হোলো সময় নেই একটুও ;
গাড়ি ধরতে পারব না বুঝি।
বাক্স থেকে টাকা বের করতে গিয়ে
ছড়িয়ে পড়ল শিকি দুয়ানি,
কিছু কুড়োলেম, কিছু রইল বা,
গ'ণে ওঠা হোলো না।
কাপড় ছাড়ি কখন ?
নীলরঙের রেশমী রুমালখানা
দিলেম মাথার উপর তুলে' কাঁটায় বিঁধে'।
চুলটাকে জড়িয়ে নিলুম কোনোমতে,
টবের গাছ থেকে তুলে নিলুম
চন্দ্রমল্লিকা বাসন্তীরঙের।

ষ্টেশনে এসে দেখি গাড়ি আসেই না,
জানিনে কতক্ষণ গেল,
পাঁচ মিনিট, হয় তো বা বিশ মিনিট।
গাড়িতে উঠে দেখি চেলি-পরা বিয়ের কনে দলে-বলে ;

আমার চোখে কিছুই পড়ে না যেন,
খানিকটা লালরঙের কুয়াষা, একখানা ফিকে ছবি।

গাড়ি চলেছে ঘটর ঘটর, বেজে উঠছে বাঁশি,
উড়ে আসছে কয়লার গুঁড়ো,
কেবলি মুখ মুচছি রুমালে।
কোন্ এক ষ্টেশনে
বাঁকে ক'রে ছানা এনেছে গয়লার দল।
গাড়িটাকে দেরি করাচ্চে মিছিমিছি।
হুইস্‌ল দিলে শেষকালে ;
সাড়া পড়ল চাকাগুলোয়, চল্‌ল গাড়ি।
গাছপালা, ঘরবাড়ি, পানাপুকুর
ছুটেছে জানলার দুধারে পিছনের দিকে,
পৃথিবী যেন কোথায় কী ফেলে এসেছে ভুলে,
ফিরে আর পায় কি না-পায়।
গাড়ি চলেছে ঘটর ঘটর।
মাঝখানে অকারণে গাড়িটা থামল অনেকক্ষণ,
খেতে খেতে খাবার গলায় বেধে যাবার মতো।
আবার বাঁশি বাজল,
আবার চলল গাড়ি ঘটর ঘটর।
শেষে দেখা দিল হাবড়া ষ্টেশন।
চাইলেম না জানালার বাইরে,
মনে স্থির ক'রে আছি
খুঁজতে খুঁজতে আমাকে আবিষ্কার করবে একজন এসে।
তারপরে দুজনের হাসি।

বিয়ের কনে, টোপর-হাতে আত্মীয় স্বজন,
সবাই গেল চলে।
কুলি এসে চাইলে মুখের দিকে,
দেখলে গাড়ির ভিতরটাতে মুখ বাড়িয়ে,
কিছুই নেই।
যারা কনেকে নিতে এসেছিল, গেল চলে।
যে জনস্রোত এ মুখে আসছিল
ফিরল গেটের দিকে।
গট্ গট্ ক'রে চলতে চলতে
গার্ড আমার জানালার দিকে একটু তাকালে,
ভাবলে, মেয়েটা নামে না কেন।
মেয়েটাকে নামতেই হোলো।

এই আগন্তুকের ভিড়ের মধ্যে
আমি একটিমাত্র খাপছাড়া।
মনে হোলো প্লাটফরম্‌টার
একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত প্রশ্ন করছে আমাকে ;
জবাব দিচ্ছি নীরবে,—
"না এলেই হোত।"
আর একবার পড়লুম পোষ্টকার্ডখানা
ভুল করিনি তো।

এখন ফির্‌তি গাড়ি কি নেই একটাও ?
যদি বা থাক্‌ত, তবু কি—
বুকের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়াচ্চে
কত রকমের "হয় তো।"
সবগুলিই সাংঘাতিক।

বেরিয়ে এসে তাকিয়ে রইলুম ব্রিজটার দিকে।
রাস্তার লোক কী ভাবলে জানিনে।
সামনে ছিল বাস্, উঠে পড়লুম।
ফেলে দিলুম চন্দ্রমল্লিকাটা।

২

অপরপক্ষ

সময় একটুও নেই।
লাল মখমলের জুতোটা গেল কোথায়;
বেরলো খাটের নিচে থেকে।
গলায় বোতাম লাগাতে লাগাতে গেছি চৌকাঠ পর্য্যন্ত,
হঠাৎ এলেন বাবা।
আলাপ সুরু করলেন ধীরে সুস্থে;
খবর পেয়েছেন দুজন পাত্রের, মিনির জন্যে।
তাঁর মনটা একবার এর দিকে ঝুঁকছে একবার ওর দিকে।
ঘড়ির দিকে তাকাচ্চি আর উঠছি ঘেমে।

রাস্তায় বেরলেম;
হাওড়ায় গাড়ি আসতে বারো মিনিট।
বুকের মধ্যে রক্তবেগ মন্দগতি সময়কে মারছে ঠেলা।
ট্যাক্সি ছুটল বে-আইনি চালে।
হ্যারিসন্ রোড্, চিৎপুর রোড্,
হাওড়া ব্রিজ্, ন' মিনিট বাকি।

দুর্ভাগ্য আর গোরুর গাড়ি আসে যখন
আসে ভিড় ক'রে।
রাস্তাটা পিণ্ডি পাকিয়ে গেছে পাট-বোঝাই গাড়িতে।
হাঁক ডাক আর ধাক্কা লাগালে কনিষ্টবল্ ;
নিরেট আপদ, ফাঁক দেয় না কোথাও।
নেমে পড়লুম ট্যাক্সি ছেড়ে,
হনহনিয়ে চললুম পায়ে হেঁটে।
পৌঁছলুম হাওড়া স্টেশনে।
কী জানি, কব্জি ঘড়িটা ফাস্ট হয় যদি পনেরো মিনিট।
কী জানি আজ থেকে টাইমটেবিলের
সময় যদি পিছিয়ে থাকে।
ঢুকে পড়লুম ভিতরে।
দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি ট্রেন,
যেন আদিকালের প্রকাণ্ড সরীসৃপটার কঙ্কাল,
যেন একঘেয়ে অর্থের গ্রন্থিতে বাঁধা
অমরকোষের একটা লম্বা শব্দাবলী।
নির্ব্বোধের মতো এলেম উঁকি মেরে মেয়ে-গাড়িগুলোতে।
ডাকলেম নাম ধ'রে,
"কী জানি" ছাড়া আর কোনো কারণ নেই
সেই পাগলামির।
ভগ্ন আশা শূন্য প্লাট্‌ফরম্ জুড়ে ভূলুণ্ঠিত।
বেরিয়ে এলুম বাইরে—
দাঁড়িয়ে আছি রাস্তার মাঝখানে।
জানিনে যাই কোন্‌দিকে।
বাস-এর নিচে চাপা পড়িনি নিতান্ত দৈবক্রমে।
—এই দয়াটুকুর জন্যে ইচ্ছে নেই
দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

শ্যামলী

ওগো শ্যামলী,
আজ শ্রাবণে তোমার কালো কাজল চাহনি
চুপ-ক'রে-থাকা বাঙালি মেয়েটির
ভিজে চোখের পাতায় মনের কথাটির মতো।
তোমার মাটি আজ সবুজ ভাষায় ছড়া কাটে ঘাসে ঘাসে
আকাশের বাদল ভাষার জবাবে।
ঘন হয়ে উঠল তোমার জামের বন পাতার মেঘে,
বলছে তা'রা উড়ে-চলা মেঘগুলোকে হাত তুলে—
"থামো, থামো,
থামো তোমরা পূব বাতাসের সওয়ারি।"

পথের ধারে গাছতলাতে তোমার বাসা, শ্যামলী,
তুমি দেবতাপাড়ায় বেদের মেয়ে ;
বাসা ভাঙো বারে বারে, খালি হাতে বেরিয়ে পড়ো পথে,
এক নিমেষে তুমি নিঃশেষে গরীব, তুমি নির্ভাবনা।
তোমাকে যে ভালোবেসেছে
গাঁঠছড়ার বাঁধন দাও না তাকে ;
বাসর ঘরের দরজা যখন খোলে রাতের শেষে,
তখন আর কোনোদিন চায় না সে পিছন ফিরে।
মুখোমুখি বসব ব'লে বেঁধেছিলেম মাটির বাসা
তোমার কাঁচা বেড়া-দেওয়া আঙিনাতে।
সেদিন গান গাইল পাখীরা,
তাদের নেই অচল খাঁচা,

তা'রা নীড় যেমন বাঁধে তেমনি আবার ভাঙে।
বসন্তে এ পারে তাদের পালা, শীতের দিনে ওপারের অরণ্যে।

সেদিন সকালে
হাওয়ার তালে হাততালি দিলে গাছের পাতা।
আজ তাদের নাচ বনে বনে,
কাল তাদের ধূলোয় লুটিয়ে-পড়া ;—
তা নিয়ে নেই বিলাপ, নেই নালিশ।
বসন্ত-রাজদরবারের নকীব ওরা,
এ বেলায় ওদের কাজ, জবাব মেলে ও বেলায়।

এই ক'টা দিন তোমায় আমায় কথা হোলো কানে কানে ;
আজ কানে কানে বলছ আমায়,—
আর নয়, এবার তোলো বাসা।
আমি পাকা ক'রে গাঁথিনি ভিৎ,
আমার মিনতি ফাঁদিনি পাথর দিয়ে তোমার দরজায় ;
বাসা বেঁধেছি আলগা মাটিতে
যে চল্‌তি মাটি নদীর জলে এসেছিল ভেসে,
যে মাটি পড়বে গ'লে শ্রাবণ ধারায়।

যাব আমি।
তোমার ব্যথাবিহীন বিদায়-দিনে
আমার ভাঙাভিটের পরে গাইবে দোয়েল ল্যাজ দুলিয়ে।
এক সাহানাই বাজে তোমার বাঁশিতে, ওগো শ্যামলী,
যেদিন আসি, আবার যেদিন যাই চ'লে॥

৬ আগষ্ট, ১৯৩৬